মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ

সাহিত্য পত্রিকা

Journal.bangla.du.ac.bd
Print ISSN: 0558-1583
Online ISSN: 3006-886X
বর্ষ: ৫৯ সংখ্যা: ৩
আষাঢ় ১৪৩১॥ জুন ২০২৪
প্রকাশকাল: এপ্রিল ২০২৫
Issue DOI: 10.62328/sp.v59i3

DOI: 10.62328/sp.v59i3.4
প্রবন্ধ জমাদান: ২৬ মে ২০২৪
প্রবন্ধ গৃহীত: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪
পৃষ্ঠা: ৭৩-৮৯

# রাইফেল রোটি আওরাত : অবরুদ্ধ সময়ের স্বর

**মোমেনুর রসুল**
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: momenurrasul3@du.ac.bd

## সারসংক্ষেপ

উপন্যাস চলমান সময়শাসিত মানুষের আনন্দ-বেদনা, আশা-ব্যর্থতা, প্রেম-পাশবিকতার অন্তরঙ্গ প্রতিচ্ছবি। এর বৃহৎ ক্যানভাসে যুগ-চেতনা, যুগ-জীবন, যুগ-যন্ত্রণা, ইতিহাসের উত্থান-পতন ও গৌরবের চালচিত্র রূপায়ণের বিশেষ সুযোগ থাকে। একজন ঔপন্যাসিক যেমন সময় ও সমাজের রূপকার, তেমনি জীবনের অনুকারকও বটে। বাংলাদেশের উপন্যাসে রাজনীতির পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের মতো গৌরবময় বিরাট অনুষঙ্গ বিচিত্রভাবে ভাষারূপ পেয়েছে। এ বোধ থেকেই সমকালীন অনেক ঔপন্যাসিক মুক্তিযুদ্ধের অবরুদ্ধ সময়ের প্রেক্ষাপট নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে আনোয়ার পাশা রচিত *রাইফেল রোটি আওরাত* উপন্যাসে বিধৃত সমকালীন সমাজ-রাজনীতির অনুষঙ্গে অবরুদ্ধ সময়ের স্বরূপ অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

## মূলশব্দ

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস, আনোয়ার পাশা, *রাইফেল রোটি আওরাত*, ইতিহাস ও উপন্যাস, ২৫শে মার্চ, গণহত্যা, রাজনৈতিক উপন্যাস।

শহিদ অধ্যাপক আনোয়ার পাশা[১] একাত্তরের ভয়াবহ দিনগুলোতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ভবনে অবস্থানকালে এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে রচনা করেছিলেন *রাইফেল রোটি আওরাত*[২] উপন্যাস। গ্রন্থটি প্রকাশের পর এই উপন্যাস সম্পর্কে অধ্যাপক আবুল ফজল বলেছেন:

> মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে এ অসামান্য বইটি তিনি লিখে রেখে গেছেন আমরা যারা বেঁচে আছি তাদের জন্য। মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে মৃত্যু-বিভীষিকার এমন ছবি আঁকা সত্যই দুঃসাধ্য। আনোয়ার পাশা তেমন এক দুঃসাধ্য কাজ করে গেছেন। তাঁর শিল্পী-প্রতিভার এ এক নিঃসন্দেহে প্রমাণ। বাংলাদেশের ঘাটিতে আগামীতে যারা জন্মগ্রহণ করবে, তারা এ দেশের ইতিহাসের এক দুঃসহ ও নৃশংসতম অধ্যায়ের এ নির্ভেজাল দলিল পাঠ করে নিঃসন্দেহে শিউরে উঠবে। (আবুল ১৯৭৩: পরিচিতি অংশ)

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকায় নিরস্ত্র বাঙালির ওপর আক্রমণ করে বর্বরোচিত গণহত্যা ঘটায়। আক্রমণকারী বর্বর বাহিনী প্রথমে ঢাকা শহরে এবং পরবর্তী সময়ে গ্রামাঞ্চলেও ব্যাপক গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন ও ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধ শুরু করে। বাঙালির স্বাভাবিক জীবনযাপন হয়ে পড়ে বিপর্যস্ত; বিপন্ন বাঙালি-মানসে নেমে আসে তীব্র শঙ্কা আর ভীতি। 'অপারেশন সার্চ লাইটে'র অন্যতম পরিকল্পনাকারী জেনারেল টিক্কা খান ৭২ ঘণ্টার মধ্যে দেশকে তথাকথিত 'বিদ্রোহী' মুক্ত করার কথা বলে, ব্যাপক গণহত্যার মাধ্যমে প্রতিবাদী বাঙালিকে চিরতরে চুপ করাতে চেয়েছিলেন (গোলাম ২০১০: ৭৯)। তাদের উদ্দেশ্যই ছিল গণহত্যার মাধ্যমে এ দেশের মানুষকে ধ্বংস করে শুধু মাটি আর সম্পদকে চিরতরে কুক্ষিগত করে নেওয়া। কেবল তাই নয়, ১৯৭১ সালের ৩রা এপ্রিল *দৈনিক বাংলা* পত্রিকায় 'পাকবাহিনীর জিঞ্জিরা আক্রমণ' শিরোনামের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২৫শে মার্চের রাতে ঢাকা শহরে হানাদাররা নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালানোর পরের দিনই ঢাকার অনেক বাসিন্দা জীবনের নিরাপত্তা পাওয়ার আশায় বুড়িগঙ্গা নদী পাড়ি দিয়ে কেরানীগঞ্জে তাদের আত্মীয়স্বজনের বাসায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। যাদের স্বজন ছিল না, তাদেরকেও কেরানীগঞ্জবাসী আন্তরিকভাবেই আশ্রয় দিয়েছিল। কিন্তু সেখানে আশ্রয় নিয়েও ঢাকা শহর থেকে পালিয়ে যাওয়া লোকজন মিলিটারিদের আক্রমণকে এড়িয়ে যেতে পারেনি। বাঙালির দৈনন্দিন জীবনে নেমে আসা বিপর্যয় ও আতঙ্কের বহুমাত্রিক দিক আনোয়ার পাশা আবেগবিবর্জিত নিস্পৃহ ভাষায় আলোচ্য উপন্যাসে বাঙ্ময় করে তুলেছেন। বিপন্ন বাঙালির ভয়ার্ত মুখচ্ছবি রচিত হয়েছে উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্রের চেতনালোকে। উপন্যাসে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের সময়ের উপস্থাপন না থাকলেও বিশেষ করে চরিত্রের মনোজগতের উল্লম্ফনময় স্মৃতিতে মুক্তিযুদ্ধের ভয়ার্ত সময়ের বিন্যাস খুঁজে পাওয়া যায়।

বস্তুত *রাইফেল রোটি আওরাত* উপন্যাসে সন্নিবেশ ঘটেছে বিচ্ছিন্ন ঘটনারাজি। 'এখানে দানবীয়ভাবে বাঙালি হত্যার নির্মম বাস্তবতাকে অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত ভাষায় সুস্পষ্ট করে দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক' (আহমেদ ২০১৫: ৩৫)। নির্মম আবহ, রূঢ় বাস্তব অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আনোয়ার পাশা একাত্তরের ২৫শে মার্চের কালরাতের দুঃসহ স্মৃতিকে ধারণ করে এ উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ নির্মাণ করেছেন। মূল কাহিনি অল্প কয়েক ঘণ্টার হলেও লেখকের

চেতনালোকে বিচরণ করেছে অসংখ্য স্মৃতি, অগণিত মানুষ। কাহিনির গতিকে ঠিক রেখে ঔপন্যাসিক তাঁর স্মৃতি ও চিন্তাসূত্রকে ক্ষেত্রবিশেষে উপস্থাপন করে গেছেন। তবে এখানে ঘটনা-পরম্পরার সূত্র সাতচল্লিশের দেশভাগের সময় থেকে শুরু করে ভবিষ্যতের অনাগত বহুদূরের স্বপ্ন পর্যন্ত প্রসারিত। উপন্যাসে এক দিকে ব্যক্তিচরিত্রের সংঘাত এবং অপর দিকে সেই সংঘাতের মধ্য দিয়ে নির্মম বাস্তব পর্যবেক্ষণ—এই দুয়ের সমন্বয়ে আনোয়ার পাশা সৃজন করেছেন এক ঔপন্যাসিক বাস্তবতা। উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মানুষ আর সেই মানুষ কোনো বিমূর্ত ধারণা বা সত্তা নয়; সুতরাং বাস্তবতাই উপন্যাসের মূল বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য উপন্যাসে এই ঔপন্যাসিক বাস্তবতা সর্বাংশে রক্ষিত হয়েছে। বেগম আকতার কামালের (২০১৪: ১৫৪) স্পষ্ট বাচন লক্ষ্যযোগ্য:

> রচনাটি একাত্তরের যুদ্ধগাথা নয়, এটি গণহত্যার বয়ান। এর কাহিনিতে যুক্ত হয়নি বাঙালির প্রতিরোধ ও গেরিলা যুদ্ধ করার ঘটনাকাল। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রথম পর্বের পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যা, লুণ্ঠন, নারী নির্যাতন ও নৃশংসতার যে প্রতিচ্ছবি আঁকা হয়েছে তার সময়সীমা এপ্রিলের প্রথমার্ধের অভিজ্ঞতা। পরিধি সংকীর্ণ হলেও বিষয়ের গভীরতা ও সংকেতব্যঞ্জনায় উপন্যাসটি একটি প্রতিভূ টেক্সট। এটি প্রতিনিধিত্ব করছে ইতিহাসব্যাপ্ত বাঙালির নিয়তির রূপককে, এবং একইসঙ্গে রূপকের দ্ব্যর্থকতা ভেঙে দিয়ে ইতিহাস-সত্য হয়ে-ওঠার অদ্বয় বাস্তবতাকে।

উপন্যাসটির আখ্যানভাগ বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই এর কেন্দ্রীয় চরিত্র সুদীপ্ত শাহিন; পেশায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক। জীবন ও জীবিকার তাগিদে নিরাপদ আশ্রয়ের প্রত্যাশায় সুদীপ্ত চলে এসেছিলেন মাতৃভূমি পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে বাংলাদেশে ১৯৫০ সালের ভয়াবহ দাঙ্গার সময়। কিন্তু এ দেশে এসেও তাঁকে চাকরির জন্য পিতৃদত্ত নাম পরিবর্তন করতে হয়েছে। পরিবর্তিত পরিচয়ে সুদীপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের পাশাপাশি একজন কবি, আদর্শ স্বামী এবং স্নেহবৎসল পিতা হিসেবে উপন্যাসে চিত্রিত। দেশভাগ-পরবর্তী অনিকেত জীবন আর দুঃসহ যন্ত্রণা বহনের পাশাপাশি একাত্তরের ভয়াবহ ২৫শে মার্চের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষ সাক্ষী সুদীপ্ত। পাকিস্তানি সৈন্যদের ভয়াবহ হামলায় কোনোমতে প্রাণে বেঁচে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ভবন ছেড়ে পরিবারসহ আশ্রয় নিয়েছেন তার বন্ধু আওয়ামী লীগের একজন সক্রিয় নেতা ফিরোজ সাহেবের বাড়িতে। সেখানে দুদিন অবরুদ্ধ জীবনের এক পর্যায়ে নিরাপদ বোধ না করায় আবার বেরিয়ে পড়েন আশ্রয়ের খোঁজে এবং পুরান ঢাকার একটি অপরিচিত বাড়িতে আশ্রয় পেয়ে সেখানে পরিবারসহ রাত্রিযাপন করেন। ২৫শে মার্চ কালরাত থেকে ২৮শে মার্চ ভোর—এই তিন দিনের ঘটনা পরিসরে আনোয়ার পাশা 'একটি জাতির হয়ে-ওঠার ইতিহাস এবং তার অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির—পৈশাচিকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রয়াস বর্ণনা করেছেন।' (অনিরুদ্ধ ২০০৫: ৬৩)

*রাইফেল রোটি আওরাতের* মূল ঘটনায় যেসব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তাতে রয়েছে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ এবং এর পরবর্তী কয়েক দিনের দৃশ্যাবলির বিবরণ। এই উপন্যাসে ব্যক্ত হয়েছে বাঙালি নিধনের নির্মম ও পৈশাচিক বাস্তবতার সুস্পষ্ট রূপ। সুতরাং উপন্যাসে তাৎক্ষণিক ঘটনার বর্ণনা ও বিবরণের যতটা গুরুত্ব দেখা গেছে, মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক

প্রেক্ষাপট নির্মাণ ততটা প্রাধান্য পায়নি। এর একটি বড় কারণ, লেখক ঢাকাতেই আত্মগোপন করে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করে উপন্যাসটি রচনা করেছেন। সেজন্য উপন্যাসের অধিকাংশ বিবরণই একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনার মতো উপস্থাপিত। যেমন:

> জনমানবহীন রাস্তার দু পাশে মাঝে মাঝে গুলিবিধ্বস্ত বাড়ি, মানুষের লাশ, পুড়িয়ে-দেওয়া জনপদের চিহ্ন-কয়েকটি দেখলেই আর কোনো বৈচিত্র্য পাওয়া যায় না। ধ্বংসের কোনো বৈচিত্র্য থাকে? বৈচিত্র্য সৃষ্টির মধ্যে কিন্তু এই বৈচিত্র্যহীন ধ্বংসলীলা দেখে বেড়ানোর মধ্যে কী একটা নেশা আছে যেন।
>
> সারি সারি স্বল্প মূলধনের দোকান—নিম্ন মধ্যবিত্তেরা কোনো মতে টিন দিয়ে বানিয়ে ব্যবসা ক'রে খাচ্ছিল। সব ওরা পুড়িয়ে দিয়েছে। ... একটা দেয়াল ঘেরা বাড়ির বিপুল আঙিনায় পোড়া মোটর গাড়ি দেখা গেল অন্তত পঁচিশ-ত্রিশখানা। ভিতরে একটা গাড়ি মেরামতের কারখানা ছিল। একজন রিক্সাচালকসহ রিক্সাটা পথের পাশে কাত হয়ে প'ড়ে আছে। দেখলেই বুঝা যায়, রিক্সা নিয়ে পালিয়ে যাবার সময় পাশ থেকে গুলি করেছে। তার শিথিল মুঠিতে রিক্সার হ্যাণ্ডেল তখনও লেগে ছিল। ... আহ্, ওই দেখ, দেখ, গাছের ডালে কিশোর বালকের লাশ ঝুলছে। ঘন ঝাঁকড়া গাছ দেখে সেখানে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজেছিল বালকটি। কিন্তু ঝাঁকড়া গাছ দেখলেই সেখানে এলো-পাথাড়ি গুলি করেছে ওরা। সেই গুলিতে সে মারা গেছে। কিন্তু ঘন ডালের ফাঁকে শরীর আটকে গিয়ে মাথাটা নিচের দিকে ঝুলছে। এখানে এটা? একটা স্কুল ছিল। আর ওখানে ওইটে দৈনিক পত্রিকার অফিস ছিল। ছিল কিন্তু নেই। আর্মি ধ্বংস ক'রে দিয়েছে। কিন্তু ধ্বংস মানে যে, এতোখানি তা এখানে না এলে বিশ্বাস করা শক্ত হ'ত। দরজা জানালা থেকে শুরু ক'রে প্রত্যেকটি মেশিন, কাগজপত্র সব গ'লে পুড়ে একাকার হয়ে গেছে—শ্মশানের কঙ্কালের মতো উলঙ্গ দেয়াল কোনো মতে দাঁড়িয়ে। ... এবং এমনি সব দৃশ্যাবলির অপূর্ব মিউজিয়াম সমগ্র ঢাকা নগরী। (আনোয়ার ২০১৯: ১৬৪)

২৫শে মার্চ কালরাতের গণহত্যার[৩] বাস্তব ও যথাযথ রূপ আলোচ্য উপন্যাসে রক্ষিত হয়েছে। বাস্তব বর্ণনার ক্ষেত্রে আনোয়ার পাশা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। পাকিস্তানি সৈন্যদের ভয়াবহ নারকীয়তার বিবরণ সুদীপ্তর প্রেক্ষণবিন্দু থেকে উন্মোচিত হয়েছে উপন্যাসের পরতে পরতে। দৃষ্টান্ত:

> গতকালের দেখা সেইসব দৃশ্যাবলী সুদীপ্তর চোখে এখনও ভাসছে। এখন তাঁর মনে হচ্ছে, জীবনে আর কখনো বোধ হয় কোনো মুহূর্তটি একা ব'সে কাটাতে পারবেন না। একা হ'লেই ওরা এসে ঘিরে ধরে যে। চিলেকোঠার ছাদে সে বাপ-ছেলের লাশ! আর সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপে দু-মাসের শিশু-কন্যা। কিংবা দেখ, জলের ট্যাঙ্কের নিচে সেই জড়াজড়ি ক'রে পড়ে থাকা ছেলেরা। কে যেন কান ধরে ঐগুলোই দেখাতে নিয়ে যায় বারে বারে।
>
> দু'তলার সিঁড়িতেই দৃশ্যটা ছিল সবচেয়ে মর্মান্তিক। সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে সুদীপ্ত প্রায় মূর্চ্ছা যাচ্ছিলেন। দেয়ালের গায়ে স্ত্রীলোকের মাথার চুল। মনে হচ্ছে দেয়ালের শরীর ফুঁড়ে বেড়িয়েছে। একটা দুটো নয়, এক গোছা চুল—প্রায় দু ফুট দীর্ঘ। ঠিক তার সামনেই দুধাপ পরে রক্তের ধারা জমাট বেঁধে আছে। সুদীপ্তর মনে হয়েছিল ছাদের ঐ তিন-চার মাসের শিশু-কন্যার সাথে এই রক্তের যোগ আছে। যুবতী মায়ের কোল থেকে ঐ শিশুকে ছিনিয়ে কাঁথার উপর ফেলে দিয়ে মাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল বর্বরের দল। সন্দেহে কয়েকবার

> চীৎকার করেছিল সেই যুবতী জননী, তারপর সংজ্ঞা হারিয়েছিল! অসংবৃতার বিস্রস্ত দেহলতা চারতলা দালানের ছাদ থেকে চুল ধ'রে টেনে নামাচ্ছে। দৃশ্যটা কল্পনায় আসতেই সুদীপ্ত শিউরে উঠলেন। ঠিক অমনি ক'রে চুল ধ'রে টেনে হিঁচড়ে যদি না নামাবে তা হ'লে এক খাবলা মাংসসুদ্ধ চুলের গোছাটা এমনভাবে উঠে আসবে কেন? আর উঠে আসতেই তারা সেটাকে ছুঁড়ে মেরেছিল দেয়ালে। কাঁচা মাংস দেয়ালে গাঁথা প'ড়ে চুলের গোছাটা এমন ঝুলছে। আর সেই মেয়েটি? মাংসসুদ্ধ মাথার চুল উঠে যাওয়ার ফলে নিশ্চয়ই বীভৎসদর্শনা হয়ে গিয়েছিল। তাই গুলি করে সেই মুহূর্তেই মারা হয়েছিল তাকে। এই রক্ত তার। (আনোয়ার ২০১৯: ১২৩)

বাস্তবিক অর্থে ২৫শে মার্চ-পরবর্তী বাংলাদেশের অবস্থা ছিল অনেকটাই জাহান্নাম-সদৃশ। সেদিন সম্পূর্ণ অসহায় ও নিরস্ত্র মানুষের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ করেছিল পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী। সমগ্র ঢাকা নগর পরিণত হয়েছিল মৃত্যুপুরীতে। রাজপথ, আবাসিক ভবন, সরকারি স্থাপনা সর্বত্রই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তৎসংলগ্ন হলসমূহেও ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছিল। বিশেষ করে জগন্নাথ হলে অংশ নেওয়া পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরতার মাত্রা ছিল ভয়াবহ:

> জগন্নাথ হলের মাঠের আরো অনেকগুলি বস্তিবাসী বিভিন্ন দিক থেকে মৃত-দেহ কুড়িয়ে এনে একত্রে জড়ো করছিল। তাদের পিছে পিছে সঙ্গিন উঁচিয়ে এসেছিল জওয়ানেরা। অতঃপর হুকুম হয়েছিল গর্ত কর। ঝুড়ি কোদাল কোথা থেকে জওয়ানেরাই দিয়েছিল, এবং সে জওয়ানদেরকে খুবই কষ্ট করে কয়েক ঘণ্টা অনবরত প্রবল গালি ও বুটের লাথি চালাতে হয়েছিল। তবেই না শেষ পর্যন্ত মনমত হয়েছিল গর্তটা। তখনও কাতরাচ্ছে এমন কিছু আহত ব্যক্তিকেও অনেক শবের সঙ্গে সেই গর্তে ফেলে দেওয়ার পর এসেছিল বস্তিবাসীদের পালা। লম্বা গর্তটার পাশে তাদেরকে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে ব'লে জওয়ানরা চাঁদমারি অভ্যাস করেছিল। একটি একটি করে সব ক'টি বস্তিবাসী গর্তে পড়ে গেলে বাকি কাজটুকু করতে হয়েছিল জওয়ানদের। পাশের স্তূপীকৃত মাটি ঠেলে দিয়ে জায়গাটা ভরাট করতে হয়েছিল তাদেরকে। (আনোয়ার ২০১৯: ৩০)

গভীর রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে আক্রমণ করে নির্বিচারে ছাত্র হত্যা করে। এমনকি বাসভবনে প্রবেশ করে আবাসিক শিক্ষকদের ওপরও তাদের নির্মম অস্ত্র ঝলসে ওঠে:

> ডঃ দেবকে ও তার পুত্রকে একই সারিতে দাঁড়িয়ে দিয়ে ওরা গুলি করে। পাশাপাশি লুটিয়ে পড়ে দুটি দেহ। ওরা পিতা-পুত্র। কিন্তু রক্তের মিল ছিল কোথায়? ওদের রক্তের মিল হয়েছে ওদের মৃত্যুর পর। এমনি রক্তের মিল হয়েছিল আরো দুজনের। দুজন প্রখ্যাত অধ্যাপক পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যক্ষ মনিরুজ্জামান ও ইংরেজি বিভাগের রীডার ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা। চৌত্রিশ নম্বর বিল্ডিংয়ের দুটি ভিন্ন ফ্ল্যাটে তাঁরা থাকতেন। নিজ নিজ ধর্মে দু'জনেরই নিষ্ঠা ছিল প্রবল। পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দুজনকে গুলি করা হলে রক্তের ধারা মিশে গিয়েছিল। সিমেন্ট বাঁধানো মেঝেতে সেই মিশে যাওয়া রক্তের জমাটবদ্ধতা অনেকেই তো দেখেছিলেন। দেখেছিলেন সুদীপ্ত কিন্তু সে রক্তের কোন্ অংশ মুসলমানের, আর কোনটুকুই বা হিন্দুর তা কি চেনা গিয়েছিল? আর কতো মর্মান্তিক ছিল সেই দৃশ্য—সেই

> রক্তমাখা পায়ের ছাপ। একাধিক পায়ের অনেক ছাপ পড়েছে কংক্রিট-বাঁধানো আসা-যাওয়ার পথের উপর। সে যেন দেখা যায় না। (আনোয়ার ২০১৯: ২৬)

২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর লক্ষ্য ছিল আরো দুটো—একটি রাজারবাগ পুলিশ লাইন, অন্যটি পিলখানায় অবস্থিত ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের (ইপিআর) সদর দপ্তর আক্রমণ:

> বাঙালি পুলিশ এবং ইপিআরদের নিরস্ত্র করতে গিয়ে পাক সেনারা নির্বিচার নিধনযজ্ঞ শুরু করে। ট্যাংক আর মেশিনগানের গুলিতে নিশ্চিহ্ন করে দেয় দুটি হেডকোয়ার্টার। ধ্বংসস্তূপের মাঝে মিশে যায় শতাধিক পুলিশ-কর্মচারীর ছিন্ন দেহ। (শামসুল ১৯৮৪: ২৯)

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা কেবল নয়, ২৫শে মার্চ শুধু নয়, পরবর্তী দিনগুলোতে নির্বিচারে মানুষ হত্যা, পাশবিক অত্যাচার, মৃত্যু ঢাকা থেকে সমগ্র বাংলাদেশে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। উপন্যাসে পাক হানাদার কর্তৃক স্ত্রী-কন্যাকে ধর্ষণ করার পরিপ্রেক্ষিতে চিত্রশিল্পী আমন অপ্রকৃতিস্থ হয়ে যায়। একজন অপ্রকৃতস্থ মানুষের অভিব্যক্তিও হানাদার বাহিনীর দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। অবস্থা এতই ভয়াবহ ছিল যে রাস্তার ধারে কয়েক দিন আমনের নিথর দেহ পড়ে থাকলেও পাকিস্তানি বাহিনী তার সৎকার করার গুরুত্ব অনুভব করেনি। পাক হানাদার বাহিনীর পৈশাচিক বর্বরতার দর্শন আনোয়ার পাশার সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণে উৎসারিত অনেকটা এ রকম:

> সর্বত্র হানাদারদের কার্যক্রমের মধ্যে এই একটা মিল ছিল ভারি সুন্দর। যা পার লুটে পুটে নাও, যুবতীদের হরণ কর, অন্যদের হত্যা কর। না, সব ঘরেই তারা ঢোকেনি। কিন্তু যেখানেই ঢুকেছে এই কার্যধারায় কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। ব্যতিক্রম শুধু ঘটেছিল সুদীপ্তর ঘরে। সেখানে হরণের জন্য নারী পায় নি, লুটপাটের যোগ্য কোনো বস্তুও পায় নি। কেননা যেদিকে তারা তাকিয়েছিল শুধু দেখেছিল বই। আর বই। ধুত্তোর বই। বই নিয়ে হবেটা কি শুনি। কাগজের বুকে হিবিজিবি আঁক কাটা যতো সব আবর্জনা। ওই আবর্জনায় হাত দিয়ে পাক-সৈন্যরা না-পাক হ'তে চায় নি। হাত যেখানে—সেখানেই দেওয়া যায় না কি। হাত দেওয়া যায় রোটি ও রাইফেলে। আর আওরাতের গায়ে। দুনিয়ার সেরা চিজ আওরাত, আওর রাইফেল। রোটি খেয়ে গায়ের তাকাত বাড়াও, রাইফেল ধরে প্রতিপক্ষকে খতম কর, তারপর আওরাত নিয়ে ফূর্তি কর। ব্যাস, এহি জিন্দেগী হ্যায়। এই তো জীবন। (আনোয়ার ২০১৯: ৭০-৭১)

বর্বর পাকবাহিনীর জীবনদর্শনের নিরিখেই আনোয়ার পাশা উপন্যাসের নামকরণ করেছেন। বাঙালিকে প্রতিহত করার জন্য এই বর্বরতার শিক্ষা ও শক্তি দুই-ই পাক-শাসকবর্গের কাছ থেকে অর্জন করে এই বাহিনী। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার উন্মেষকাল থেকেই পাক-শাসকচক্রের এ দেশীয় মানুষের প্রতি হিংসাত্মক মনোভঙ্গি দৃষ্টিগোচর হয়। দীর্ঘ তেইশ বছর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর একমুখী নেতিবাচক আচরণ পূর্ববাংলার মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিচয়কে খর্ব করে তোলে। উপন্যাসের প্রারম্ভে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক পরিবেশের বর্ণনা দিয়ে ঔপন্যাসিক উচ্চারণ করেন:

> একটা পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল বটে উনিশ শো সাতচল্লিশের চৌদ্দই আগস্ট। সেটা পাকিস্তানের রাজনৈতিক সত্তা, সেটা দেহ, রাষ্ট্রের প্রাণ হচ্ছে তার অর্থনীতি, এবং তাঁর চিন্ময়

> সত্তার অভিব্যক্তি সাংস্কৃতিক বিকাশের মধ্যে। ঐখানেই ছিল গণ্ডগোল। হাজার মাইলের ব্যবধানে বিরাজিত দু'টো অংশের মধ্যে একটা অর্থনীতি গ'ড়ে উঠলে তাতে একটা অংশের দ্বারা অন্য অংশের শোষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবেই, অর্থনীতির ক্ষেত্রে একাংশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে অন্য অংশের উপর। মুসলিম লীগ প্রাণপণে সেই অর্থনৈতিক প্রাধান্য দেশের পশ্চিমাংশে প্রতিষ্ঠা করার জন্য উঠে-প'ড়ে লেগেছিল। (আনোয়ার ২০১৯: ৩)

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের অনিবার্য বাস্তবতা-সূত্রে এই উপন্যাসে লেখক পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তান রাষ্ট্রের গঠনটিই ছিল একপেশে এবং এই একপেশে রাষ্ট্র গঠনের মূল লক্ষ্য ছিল শোষণ। অব্যাহত শোষণ আর বঞ্চনার মধ্য দিয়ে পূর্ববাংলার মানুষের জীবনমান হয়ে উঠেছিল নিষ্করুণ। শুধু অর্থনৈতিক মুক্তিই নয় আত্মমর্যাদার মধ্য দিয়ে একটি সাংস্কৃতিক মুক্তিও ছিল পূর্ববাংলার মানুষের প্রধান দাবি। একইসঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষায় বঞ্চিত জাতির আর্তনাদ সেই দাবিকে আরো তীব্র করে তোলে। পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের পীড়ন-পেষণে বাঙালির অস্তিত্বের সংকট, সংঘাতময় পরিস্থিতি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রচনা করে। *রাইফেল রোটি আওরাত* উপন্যাসে ২৫শে ও ২৬শে মার্চের দুটো রাত সুদীপ্তর চেতনালোকে উপস্থাপিত হয়েছে 'দু'টো যুগ যেন। পাকিস্তানের দুই যুগের সারমর্ম' (আনোয়ার ২০১৯: ১) রূপে।

পূর্ববাংলার ভূমি দখলের পাশাপাশি নারীকে অধিকৃত করার মধ্যযুগীয় বাসনাও পাকিস্তানি বাহিনীর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। 'আধুনিক যুগে পাকিস্তানি বাহিনী রচনা করেছিল নারী লোভের বীভৎস ও লোলুপ ইতিহাস। নারী তাদের কাছে কোনো মর্যাদা পায়নি। বাঙালিকে পদানত করার জন্য নারীকে দাসীতে নামিয়ে তাদেরকে ভোগ্যপণ্যে রূপান্তরিত করে' (সোহেল ২০২৩: ১৬৯)। মুক্তিযুদ্ধনির্ভর সাহিত্যে পাকিস্তানিদের অত্যাচার-নিপীড়নের চিত্রে নারীর প্রতি অত্যাচারের বিষয়টি জোরালো ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। 'মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ দিনরাত্রি, দুঃস্বপ্ন-সাহসের পরিচয় পাওয়া যায় বিজয়-বিক্রমের গাথায়, পাকিস্তানি বাহিনীর অকথ্য নির্যাতনের চিত্রে-অভিজ্ঞানে, নারীর প্রতি অমানবিক আচরণের অনুপুঙ্খ বর্ণনায়' (আরজুমন্দ ২০২৪: ১২২)। আনোয়ার পাশা *রাইফেল রোটি আওরাত* উপন্যাসে বাস্তবে ঘটে যাওয়া রক্তাক্ত বাংলার ক্ষত-বিক্ষত নারীর দুঃস্বপ্নময় জীবনাভিজ্ঞতার চিত্র উপস্থাপন করেছেন। এ বক্তব্যের সমর্থন মেলে নিম্নোক্ত মন্তব্যে:

> পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী আর তাদের এ দেশীয় দোসরদের হাতে বাংলার লক্ষ নারীর লাঞ্ছনা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের একটি বেদনার্ত পরিচ্ছেদ। দেশমাতৃকার মতোই তারা ছিন্নভিন্ন-ধর্ষিতা। তাদের কাছে মুক্তিযুদ্ধ মানেই এক দুর্মর যন্ত্রণার অতীত। (বিশ্বজিৎ ১৯৯১: ১১০)

মুক্তিযুদ্ধে নারীর প্রতি বর্বর পাকিস্তানি সেনারা যে পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছিল সেই মৃত্যু-বিভীষিকার নির্মম চিত্র পাওয়া যায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত *দৈনিক কালান্তর* ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ তারিখের পত্রিকায়:

> পাক-সেনাবাহিনী বাংলাদেশ আক্রমণের প্রথম দিন থেকেই বর্বর পাশবিক উপায়ে শত-সহস্র নিঃসহায় নারীদের মৃত্যুর সাথে ঠেলে দিচ্ছে। প্রতি ঘরে ঘরে হানাদাররা বয়সের সীমার ভেদাভেদ না করেই নাবালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা নারীকে আক্রমণ করে ভোগ-

> লালসাতৃপ্ত করেছে। নাবালিকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছেদ করে, অন্তঃসত্তা নারীকে বৃদ্ধাকে পাশবিক অত্যাচারে জর্জরিত করে এই খুনিদল শত-সহস্র রমণীকে হত্যা করছে। (মালেকা ২০২০: ১৮৫-১৮৬)

আওরাত (নারী) নামেই পাকিস্তানি সেনারা লোলুপ হয়ে ওঠে। আর নারী যদি সুন্দরী সম্ভ্রান্ত পরিবারের হয়ে থাকে তার দুর্গতিও হয় বেশি। আলোচ্য উপন্যাসে নারীর প্রতি পাকিস্তানি শাসকবর্গের সহিংসতার পূর্ণাঙ্গ চিত্র আনোয়ার পাশা বিস্তারিত বিবরণসহ উপস্থাপন করেছেন:

> তবে কি সেই কানাঘুষোটা সত্য? সাংবাদিক মহলে সে কানাঘুষো শুনেছিল—শহরের সম্ভ্রান্ত মহিলাদের ধরে নিয়ে গিয়ে ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে সামরিক অফিসারদের জন্য একটি গণিকালয় স্থাপন করা হয়েছে। সংবাদটা যে সত্য তার প্রমাণ পরে নাজিম হাতে হাতেই পেয়েছিল। দিনের বেলা দাসীবৃত্তি এবং রাতে গণিকাবৃত্তি—এই দুই কর্মে নিযুক্ত করা হয়েছে শহরের বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েকে। সেখানে তাদেরকে শাড়ি পরতে দেওয়া হয় না, কেবল সায়া প'রে থাকতে হয়। পাছে কেউ গলায় ফাঁস পরে আত্মহত্যা করে সেই জন্যই এই ব্যবস্থা। (আনোয়ার ২০১৯: ৭৬)

বাঙালি নারী-লোলুপ পাকিস্তানি সেনাদের সহযোগী ছিল রাজাকার-আলবদর ও ঘাতক দালালরা। তাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় নিত্যনতুন নারী সংগ্রহ করে আনা হতো পাকিস্তানি সেনাদের বিনোদন, সম্ভোগ ও মনোরঞ্জনের জন্য। পাকিস্তানি সেনারা এসব নারীদের বিবস্ত্র করে রাখত, তাদের প্রতি পাশবিক নির্যাতনে তাদের সারা শরীর হয়ে উঠত ক্ষত-বিক্ষত। পৈশাচিক এ নির্যাতনের কারণ ছিল পাকিস্তানি সেনাদের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা, 'উই উইল মেক দিস কান্ট্রি আ ল্যান্ড অব প্রস্টিটিউটস, আ ল্যান্ড অব স্লেভস, আ ল্যান্ড অব বেগারস।' (মালেকা ২০২০: ১৬৩)

শুধু তাই নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলকেও পাকিস্তানি দস্যুরা টার্গেট করে তাদের রিরংসা চরিতার্থ করতে। সম্ভ্রম বাঁচাতে হলের ছাদ থেকে মুসলিম ও হিন্দু নারীরা নিজ নিজ স্রষ্টার নাম নিয়ে দল বেঁধে আত্মহত্যা করে। আবার পাকিস্তানি বাহিনীর সমান্তরালে স্থানীয় অবাঙালি বিভিন্ন জায়গায় তাদের সহযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বাঙালিদের সহায় সম্পদ দখলের উৎসবে মেতে ওঠে। কেবল তাই নয় বিভিন্ন জায়গায় লুটতরাজ চালিয়ে সেই দায় বাঙালিদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয় তারা। দৃষ্টান্ত:

> শান্তিনগর বাজারের কাছে—বহু মানুষ। এতোগুলো মানুষ এখানে করছে কি? বাজার লুট করছে। বুঝতে বেশি বিলম্ব হয়নি ফিরোজের। প্রথমেই বুঝলেন জনতার ভাষা—বাংলা নয়। উর্দু ভাষার প্রবল বাক্যস্রোত অনর্গল প্রবাহিত হচ্ছে আর বোঝাই হচ্ছে ট্রাকগুলি। গম, ছোলা, গুঁড়ো দুধের টিন, চা, চিনি, কেরোসিন, ঘি, সোয়াবিন এবং সেই সঙ্গে আরো কতো কি। পাঁচটা ট্রাক ইতিমধ্যেই বোঝাই হয়ে গেছে। ষষ্ঠটি বোঝাই হচ্ছে। আর একটি জওয়ান মুভি ক্যামেরায় সেই বাজার লুটের ছবি নিচ্ছে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। কিন্তু কেন? কারণটা সেই মুহূর্তেই ফিরোজ বুঝতে পারেন নি। বুঝেছিলেন বহু পরে যখন একটি সাংবাদিক-সম্মেলনে ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন, বাঙালিরা বিহারীদের প্রাণ নিতে এবং সম্পত্তি লুটপাট করতে শুরু করলে তখন বাধ্য হয়ে তাঁকে সেনাবাহিনী শহরে নামাতে হয়েছিল। (আনোয়ার ২০১৯: ১৫৮-১৫৯)

পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ স্থানীয়ভাবে জনগণকে বোকা বানানো ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীয় ভাবমূর্তি বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করে, ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। বাংলাদেশের মানুষের মুক্তিসংগ্রামকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা ও জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য এমন কোনো অপকর্ম নেই, যা তারা করেনি। বিভিন্নভাবে ভয় হুমকি ও প্রলোভন প্রদর্শন করে তারা দালাল সৃষ্টি করতে উদ্যত হয়। ঔপন্যাসিকের ভাষায়:

> সামরিক কর্তৃপক্ষের এই মুহূর্তেই কিছু দালাল দরকার। মুসলিম লীগ বা জামাতে ইসলামের লোক হিসাবে যারা চিহ্নিত হয়ে আছে তাদের কথার এখন খুব একটা দাম হবে না। সে জন্য খোদ আওয়ামী লীগের কোনো লোক পেলে ভালো হয়! গাজী সাহেব তাঁর ভাইপো ফিরোজকে যদি হাত করতে পারেন তা'হলে মওলানা জানিয়েছেন, সরকার তাকে একটা আমদানি লাইসেন্স দিতে রাজী আছে। ফিরোজকে কি করতে হবে তারও সামান্য ইঙ্গিত পত্রে আছে। আপাতত সামরিক বাহিনীর কাজ সমর্থন করে একটা বিবৃতি দিতে হবে— বলতে হবে, আওয়ামী লীগের কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতিকারী যে দেশকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিল তার সাথে অধিকাংশ আওয়ামী লীগ সদস্যের কোন যোগ নেই। ওই দুষ্কৃতিকারীদের দমন করতে গিয়ে সেনাবাহিনীকে যে ব্যবস্থা নিতে হয়েছে সেটা যথেষ্ট সময়োপযোগী হয়েছে; ওই ব্যবস্থা গৃহীত না হলে দেশ জাহান্নামে যেত ... ইত্যাদি। (আনোয়ার ২০১৯: ১৫০)

উপন্যাসে অবরুদ্ধ সময়ের স্বর সর্বত্রই দৃশ্যমান। মৃত্যুর বিভীষিকার মাঝখানে অবস্থান করে অসহায় বিপন্ন মানুষের শত্রুকবলিত নিজ দেশে নিজের প্রকৃত সত্তাকে রক্ষা করবার জন্য নিরন্তর নিরাপদ আশ্রয় সন্ধানের নীরব সংগ্রামই উপন্যাসে মূর্ত হয়ে উঠেছে। 'এ উপন্যাসের প্রতিটি ঘটনা সত্যাশ্রয়ী শুধু নয়, পরিপূর্ণরূপে সত্য। এর প্রতিটি চরিত্র বাস্তব-পরিবেশ থেকে জন্মগ্রহণ করেছে' (মনসুর ২০০৮: ৮৪)। যদিও উপন্যাসে চরিত্র নির্মাণে আনোয়ার পাশা সর্বাংশে সফলতা দেখাতে পারেননি। অবশ্য উপন্যাসটির প্রকৃতি চরিত্র সৃষ্টির অনুকূল নয়। 'ঘটনার মর্মলোকে উপন্যাসে যেসব চরিত্র উঠে এসেছে তা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণকারী বাঙালি এবং স্বাধীনতা বিরোধীদের চালচিত্রের ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে উৎকীর্ণ' (আমিনুর ২০১৮: ১৬৪)। সুদীপ্ত শাহিন থেকে শুরু করে ড. আব্দুল খালেক, মালেক সাহেব, হাসিম শেখ, রাজনৈতিক নেতা ফিরোজ, জামাল সাহেব, চিত্রশিল্পী আমন, বীরাঙ্গনা পলি, রোশেনা, কমিউনিস্ট কর্মী বুলা, শেখ মুজিবুর রহমান, বিজন বিহারী, মোনায়েম খান, আইয়ুব খান, টিক্কা খান এ দেশীয় কতিপয় বাঙালি ও অবাঙালি দালাল, দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী, পাকিস্তানি সৈনিক সকলেই উপন্যাসের ঘটনার পর্বে বিকশিত চরিত্র। বলা যেতে পারে উপন্যাসটি ঘটনাপ্রধান, চরিত্রপ্রধান নয়। এখানে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত কেন্দ্রীয় চরিত্র সুদীপ্ত শাহিন। সমগ্র উপন্যাসে লেখক সুদীপ্ত শাহিন চরিত্রটির মধ্য দিয়ে অবরুদ্ধ সময়ের চালচিত্র প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। ফলে চরিত্রটি বাংলাদেশ আর বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংকল্প-প্রত্যয় আর স্বপ্ন-কল্পনার প্রতীক হয়ে উঠেছে। সুদীপ্ত শাহিন তাই কেবল একটি চরিত্র নয়, অনেকগুলো জীবন। ২৫শে মার্চের রাত থেকে ২৮শে মার্চের ভোর পর্যন্ত এ গ্রন্থের ঘটনাপ্রবাহ সীমিত; কিন্তু এর আবেদন এই সময়সীমার আগে ও পরে বহুদূর বিস্তৃত। সুদীপ্ত উপন্যাসের যাবতীয় ঘটনাংশ সমানভাবে প্রত্যক্ষ করেছে। তার চরিত্রটিতে ব্যক্তির দ্বন্দ্বমুখর মানস-সংঘাতের স্বরূপটি পূর্ণাঙ্গভাবে চিত্রিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সুদীপ্ত চরিত্রে উদার,

অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেলেও চরিত্রটি শেষ পর্যন্ত তার শ্রেণি চারিত্র্য অর্থাৎ মধ্যবিত্তজীবনের গণ্ডিকে অতিক্রম করতে পারেনি। ভূঁইয়া ইকবাল (২০২১: ৬১) এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন:

> কেন্দ্রীয় চরিত্র সুদীপ্ত শাহিন নায়কের উপযোগী কিনা তা নিয়ে সংশয় থাকা স্বাভাবিক। শুধুই দ্রষ্টা তিনি, বৃহৎ সংগ্রামের উপলব্ধি তাঁর চেতনার বেলাভূমিতে কোথায়? অসূর শক্তির সঙ্গে সমগ্র জাতির যে দ্বন্দ্ব সংহত করার সামর্থ্য সুদীপ্তর মধ্যে উদ্দীপ্ত হতে আমরা দেখিনি। বিচিত্র সম্ভাবনা তাঁর চেতনার মুকুরে প্রতিফলিত মাত্র, যেগুলো সচেতন অনুভূতি হয়ে সংক্রমিত হতে জানে না।

মুক্তিযুদ্ধের মতো এত বড় একটি ঘটনা সুদীপ্ত শাহিনের চেতনাকে নাড়া দিলেও তাকে সাহসী করে তোলেনি। প্রধান চরিত্রের এই মানস-দ্বন্দ্বকে আনোয়ার পাশা দক্ষতার সাথে রূপায়িত করলেও কোনো মহৎ চরিত্রের উপযোগী বা সফল চরিত্রে উত্তরণ ঘটাতে পারেননি। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, অধ্যাপক সুদীপ্ত শাহিন চরিত্রটির মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিকের নিজস্ব ব্যক্তিসত্তার প্রতিফলন ঘটেছে। ফলে মধ্যবিত্তসুলভ মূল্যবোধ ও মানসিকতাই শেষ পর্যন্ত উপন্যাসে তার চরিত্রটিকে বলিষ্ঠতা দান করেনি। কারণ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় চরম বাস্তবতা জীবনের মুখোমুখি হলে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মাঝে টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়। আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে:

> মধ্যবিত্তের সমাজ মানুষের দুটি চেহারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে—একটিতে আছে ভীরুতা, নিরাপত্তার প্রত্যাশা, আরাম বা স্বাচ্ছন্দ্যপ্রিয়তা, সুবিধাবাদ ইত্যাদি, যেটি তার সনাতন রূপ; অপরটিতে দেখি এই সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তীর্ণ হবার মতো একটা চেতনা। বলা বাহুল্য প্রায় সব ক্ষেত্রেই অবধারিতভাবে প্রথমটিরই জয় হয়। (সারোয়ার ১৯৯১: ৯৭-১৯৮)

উপন্যাসের প্রথম থেকেই সুদীপ্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিমণ্ডলে ঘটে-যাওয়া ২৫শে মার্চের কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অমানুষিক বর্বরতার যে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন, তা তাঁর চেতনাকে বিপন্ন ও রক্তাক্ত করে তোলে:

> এতো প্রচণ্ড আওয়াজ সুদীপ্ত কখনো শোনেন নি। এতক্ষণ এই আওয়াজটা কই ছিল না। সম্ভবতঃ কামান দাগছে ওরা, কিন্তু কোথায়? সারা এলাকার ঘর-বাড়ি সব ধূলিসাৎ ক'রে দেবে নাকি। গুলির হাত থেকে বেঁচে এখন ছাদচাপা প'ড়ে মরতে হবে। উহ কি বিকট আওয়াজ। আর গন্ধ। বিশ্রী ঝাঁঝালো গন্ধে বাতাস ভরে গেছে। ছাদ যদিও মাথায় না ভেঙে পড়ে তা হলেও এই গন্ধেই মরতে হবে। এই কূটগন্ধ দূষিত বাতাস কিছুক্ষণ টানলেই নির্ঘাত মৃত্যু। (আনোয়ার ২০১৯: ১১৫)

বস্তুত ১৯৭১-এর ২৫শে ও ২৬শে মার্চের রাত দুটি দুই যুগ মনে হয়েছে সুদীপ্তের কাছে। অবরুদ্ধ ঢাকা নগর কখনো কেটেছে কারফিউ জারিতে, কখনো সামান্য সময়ের জন্য কারফিউহীন পরিবেশে। তবে যে সময়টিতে কারফিউ তুলে নেওয়া হতো, সে সময়টিতে বাঙালির জনজীবনে কিছুটা স্বস্তি আসলেও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে কাটাতে হতো তাদের। কারণ, পথে বের হলে পাকিস্তানি সৈন্যদের রক্তচক্ষু আড়াল করা যেত না। যে-কোনো মুহূর্তে তারা সড়কে যানবাহন আটকিয়ে সন্দেহভাজন যে-কোনো যাত্রীকে বা পথচারীকে ডেকে নিয়ে

শনাক্ত করার চেষ্টা করত তারা বাঙালি কি না। এমনকি খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হতো তাদের ধর্ম, রাজনৈতিক পরিচয়ও। সুদীপ্ত, ফিরোজ তাঁরাও টহলধারী মিলিটারিদের হাতে এ ধরনের ভীতিকর পরিস্থিতির শিকার হয়েও ভাগ্যক্রমে রক্ষা পেয়েছে, পেয়েছে বুদ্ধির জোরে। এমনকি রক্ষা পেয়েছে বারবার ধরা পড়ার পরও বিজন বিহারীর মতো বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রও।

পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর নির্মম আচরণের সমান্তরালে এ দেশীয় দালালদের যে স্বরূপ আনোয়ার পাশা সমকালে অবলোকন করেছিলেন, তারও পূর্ণাঙ্গ চিত্র আলোচ্য উপন্যাসে উন্মোচিত হয়েছে। বাঙালি নিধনযজ্ঞে পাকিস্তানিদের সহায়কশক্তি হিসেবে রাজাকার দালালরূপী এ দেশীয় কিছু শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ছিল প্রশ্নাতীত। উপন্যাসে এমনই দুই শিক্ষিত দালালের দৃষ্টান্ত মেলে—মি. মালেক ও ড. খালেক। তারা দুই ভাই মনেপ্রাণে পাকিস্তানের অনুসারী। পাকিস্তান রাষ্ট্র বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সর্বক্ষণ গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থেকেছে তারা। তাদের মতে, যারা পাকিস্তান চায় না, তারা ইসলামের শত্রু। অতএব শত্রু হত্যা করা বৈধ। এই দুই সহোদরের মধ্যে ড. মালেক সুবিধাবাদী স্বার্থপর দালাল। তাই সে সুবিধা বুঝে ২৫শে মার্চ রাতে লেবাস পরিবর্তন করে পাকিস্তানি হয়। কিন্তু মি. মালেক শেষ পর্যন্ত নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি, রক্ষা করতে পারেনি তার পরিবারকেও। বর্বর পাকিস্তানি সৈন্য পুত্র, কন্যাদ্বয়সহ মালেককে হত্যা করে তার স্ত্রীকে ধরে নিয়ে যায়। উপন্যাসে যে মালেকের চরিত্র ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়েছে পাকিস্তানিদের দালালরূপে, তার পরিণতিও ঘটেছে পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতেই। মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলনের উত্তাল সময়পর্বে এ দেশীয় দালালদের যেমন অভাব ছিল না, তেমনি অভাব ছিল না মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেও। মি. মালেকের ছোট ভাই ড. খালেক এর উজ্জ্বল উদাহরণ। ড. খালেক উপন্যাসে মালেকের বর্ধিত সংস্করণ বলা যেতে পারে। তার বিশ্বাস:

> ইসলামের খেদমতের জন্য পাকিস্তান হয়েছে। আর পাকিস্তান বানিয়েছেন কায়েদে আযম, এবং পাকিস্তানের রক্ষক হচ্ছে সেনাবাহিনী। অতএব ইসলাম কায়েদে আযম, পাকিস্তান ও পাকিস্তানের সেনাবাহিনী—এদেরকে বিনা বিতর্কে মেনে নিতে হবে। ঈমানদার হ'তে হবে। পাকিস্তানী মুসলমানের ঈমানের পাঁচ স্তম্ভ হচ্ছে—আল্লাহ, আল্লাহর রসুল, কায়েদে আযম, পাকিস্তান আর পাকিস্তানের সেনাবাহিনী। (আনোয়ার ২০১৯: ২২)

সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে অবস্থান করে খালেক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও জাতীয় চেতনার ঐক্যে ফাটল ধরানোর জন্য দেশের সব শহিদমিনার ভাঙতে চেয়েছে। লক্ষ্য শহিদমিনার ভেঙে মসজিদ নির্মাণ। অবরুদ্ধ অগ্নিগর্ভ একাত্তরের সমাজ প্রতিবেশে এমন উগ্র সাম্প্রদায়িক আচরণ চরিত্রটিকে বাস্তবোচিত করে তুলেছে নিঃসন্দেহে। মি. মালেক, ড. খালেক ছাড়াও দালাল চরিত্র হিসেবে তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ওসমান গণিও উপন্যাসে চিত্রিত। গভর্নর মোনায়েম খানের পৃষ্ঠপোষকতায় ওসমান গণি দোর্দণ্ড প্রতাপে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন কার্যের নামে অরাজকতা সৃষ্টি করেছেন। আনোয়ার পাশার সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ উৎসারিত বর্ণনাংশ:

> কেবল নিজের উচ্চাভিলাষ পূরণের জন্য যিনি একজন মূর্খের তাঁবেদার হতে পারেন তাঁর নাম কি দেওয়া যেতে পারে? সে কি যেমন তাঁবেদারি? হুজুরের নির্দেশে ছাত্রদের ডিগ্রি নেওয়া থেকে শুরু করে ছাত্র নামধারী গুন্ডা লেলিয়ে দিয়ে অধ্যাপককে পিটানো পর্যন্ত কোনোটাই বাদ যায়। (আনোয়ার ২০১৯: ২৬)

সমকালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর যেমন দালালি করেছে এ দেশের কতিপয় বুদ্ধিজীবী, তেমনি মোনায়েম খান, নূরুল আমিনদের মতো দেশীয় রাজনৈতিক নেতারও দালালি করেছে। দালালি এমন স্তরে উন্নীত হয়েছিল যে মোনায়েম খানসহ সংশ্লিষ্ট নেতারা উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা চালায় সারা বাংলাদেশে। সে সময় রবীন্দ্রসাহিত্য বর্জনের প্রচেষ্টা উগ্র সাম্প্রদায়িকতারই বহিঃপ্রকাশ। রবীন্দ্রসাহিত্য বর্জনের আহ্বান জানিয়েও যখন তার বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছিল না, তখন এই মোনায়েম খানই গভর্নর থাকাকালে অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাইকে রবীন্দ্রসংগীত রচনার অনুরোধ করেছিলেন। এমনকি মোনায়েম খান যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর, তখন তাকে কেউ আচার্য বললে তিনি উত্তেজিত হয়ে বলতেন:

> আমারে কি তোমরা হিন্দু ঠাওরাতেছ? মুসলমানের আচার্য কওয়া বড়োই দুষের (দোষের) কথা। কুটি কুটি (কোটি কোটি) টাকা খরচ কইরা তোমাদেরে আচ্ছা কইরা শিক্ষা দিবার লাইগা এই যে বিল্ডিং বানাইয়া দিছি তা কি এমনি কাফের হওন লাইগা? কেন, আমারে তোমরা চ্যাঞ্চেলর কইতে পার না। (আনোয়ার ২০১৯: ১৩৩)

*রাইফেল রোটি আওরাত* উপন্যাসে আনোয়ার পাশা অবরুদ্ধ বাঙালির অস্তিত্ব, সংশয়তাড়িত আর্তনাদের স্বর প্রতিবিম্বিত করেছেন। ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা ব্যক্তির মানসজগৎ, তার অন্তর্গত ভাবনা, জীবনদর্শন, রাজনৈতিক বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বোধ, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের স্তর, ভীতি ও সাহসের মাত্রাকে নানাভাবে অবলোকন করেছেন ঔপন্যাসিক। উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহে সুদীপ্ত শাহিনের সমান্তরালে তার বন্ধু মহীউদ্দিন ফিরোজের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ফিরোজ কবিতা লিখতেন, দেশ আর দেশের মানুষের প্রতি ছিল তার নিবিড় ভালোবাসা। এ কারণেই ইয়াহিয়া খানের বেতার ভাষণের পর আওয়ামী লীগের সক্রিয় কর্মীরা যখন এলাকা ছাড়ার কথা ভাবছে, তখন আওয়ামী লীগ কর্মী ফিরোজ ভেবেছেন বিকল্প কিছু। নিজের নিরাপত্তার কথা মোটেও ভাবেননি তিনি। উপন্যাসে তাঁর বন্ধুপ্রীতির পরিচয় উল্লেখ করার মতো। সুদীপ্ত ফিরোজের বন্ধু, কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে তাঁরা একসঙ্গে পড়েছেন। এ কারণেই দুর্যোগ মুহূর্তে বন্ধুর বিপদে তাঁকে নিজ বাড়িতে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হননি। শুধু তাই নয়, নিরাপত্তার জন্য বন্ধুকে শেষ পর্যন্ত নিজের গাড়িতে করে বন্ধুর পত্নীর আত্মীয়ের বাড়িতে পৌঁছেও দিয়েছেন।

১৯৭১ সালের মার্চের সেই কালরাত থেকে বর্বর সেনাবাহিনীকে পাশবিক কাজে সহযোগিতা করেছেন যেমন এক শ্রেণির এ দেশীয় দালাল, তেমনি গৃহহারা মানুষগুলোকে অন্ন দিয়ে, বাসস্থান দিয়ে সাহায্য করেছেন এ দেশেরই অগণিত দেশপ্রেমিক নাগরিক। বাঙালির সেদিন চরম দুর্দিনে, যেদিন—'হয় মুক্তি, না হয় মৃত্যু' ছিল বাঙালির শপথ—সেদিন এক বাঙালি অন্য অপরিচিত বাঙালিকে আপন করে নিয়েছেন চিরদিনের পরিচিতজনের মতো। বন্ধু ফিরোজের গৃহে আন্তরিক সহানুভূতি আর নিরাপদ জীবনের যে আস্বাদ সুদীপ্ত পেয়েছিলেন, পরবর্তী

সময়ে অপরিচিত বাড়িতে সুদীপ্ত তারই সুফল ভোগ করেছেন। পুরনো ঢাকার সেই অপরিচিত বাঙালি বাড়ির অধিকর্তা কমিউনিস্ট পার্টির অসাধারণ কর্মী বুলার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সুদীপ্তের মতো বহু গৃহহারা মানুষ আশ্রয় পেয়েছিল। এ উপন্যাসে বুলা একটি বিপ্লবী চরিত্র। বুলা বাইরে থেকে একজন জামায়াত কর্মী হিসেবে পরিচিত। তাকে শুধু সময়ের প্রয়োজনেই সেই ছদ্ম প্রচ্ছদ বহন করতে হয়। কিন্তু রাজনৈতিক প্রচ্ছদে তার আদর্শ ছিল কমিউনিস্ট পার্টি। স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তি হিসেবে বুলা তার বাড়িতেই নেতৃত্ব গড়ে তোলে। নিজ খরচে এবং ঘরে যা আছে তাই দিয়েই বুলা নিজ উদ্যোগে সুদীপ্তের মতো বহু অপরিচিত মানুষকে যথাসাধ্য আপ্যায়ন করে। উপন্যাসে অবরুদ্ধ সময়ের রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তে সুযোগ বুঝে কাউকে পার করে অথবা কাউকে লুকিয়ে রেখে তার মহত্ত্বের পরিচয় রেখেছে। এভাবে বুলা স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়সীমায় বুলা উপন্যাসে আবির্ভূত হলেও তার স্বল্পকালীন উপস্থিতি পাঠককে বিমোহিত করে তোলে।

ইতিহাসের বিশেষ একটি অধ্যায় নিয়ে *রাইফেল রোটি আওরাতে*র ঘটনাংশ রচিত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই উপন্যাসে কিছু ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গ চরিত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এ উপন্যাসে শেখ মুজিবুর রহমান অন্যতম চরিত্র হয়ে উঠেছে। উপন্যাসে তাঁর চারিত্রিক বিবিধ গুণের পরিচয় সেভাবে উল্লেখ না থাকলেও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়। যেমন সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়, তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা, অনমনীয় ব্যক্তিত্ব ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা। এছাড়া ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে ৭ই মার্চের ভাষণ তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক। শেখ মুজিবের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে পাই—গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর অবিচল আস্থা। তাঁর উক্তিই এ সত্যের সাক্ষ্য বহন করে:

> কেউ যদি যুক্তির কথা বলেন এবং তিনি যদি সংখ্যায় একজনও হন, আমরা তাঁর কথা মানব। ... এই তো বিবেকবান সভ্য মানুষের কথা। পাকিস্তানি জালেমদের হাতে এবার বঙ্গবন্ধুকে পড়তে দেওয়া হবে না কিছুতেই। মনে মনে কিছুক্ষণ ছটফট করলেন ফিরোজ। না, মুজিব ভাই বোধ হয় কথা শুনবেন না। ঐ কথাটা একবার যদি তাঁর মাথায় ঢুকে থাকে যে, তাঁকে না পেলে ওরা সাধারণ নিরীহ বাঙালিকে হত্যা করবে তা হ'লে তাঁকে নড়ানোর সাধ্য কারো হবে না। কিন্তু তাঁর বেঁচে থাকা যে দরকার। আমরা না হয় কিছু মরলাম, কিন্তু তিনি যদি বাঁচেন ... শেখ মুজিবুর রহমান—শুধুই একটি নাম তো নয়, তা যে বাঙালির আত্মমর্যাদার প্রতীক। এবং আনন্দময় জীবনেরও। (আনোয়ার ২০১৯: ৯৯-১০০)

*রাইফেল রোটি আওরাতে* নেই কোনো গভীর জীবনদর্শন। এখানে বর্ণিত হয়েছে গণহত্যার শিকার ভয়ার্ত মানুষের অনির্দিষ্ট গন্তব্য ও প্রতিরোধ-প্রস্তুতির চিত্র। অবরুদ্ধ সময়ের স্বর প্রতিধ্বনিত হয়েছে গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী ভয়ার্ত, লড়াকু মানুষের বেঁচে থাকার তীব্র আকুতিতে। শুধু তাই নয়, বাঙালির প্রতিরোধ প্রস্তুতি, দৃঢ় সংকল্প ও দোদুল্যমান মনস্তত্ত্বের স্বাক্ষর রয়েছে সমগ্র উপন্যাসজুড়ে। সমালোচক সুধাময় দাসের মন্তব্য স্মর্তব্য:

> উপন্যাসটিতে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি ও এর লগ্নকাল মূর্ত হয়েছে যা প্রশ্নাতীতভাবে হয়ে উঠেছে সমকালের বাস্তব ইতিহাসের সাহিত্যিক দলিল। ঘটনা-তাড়িত বিপন্ন ও সাহসী মানুষেরাই হয়েছে এই দলিলের নিয়ামক। সুডৌল কাহিনী, মুখ্য চরিত্রের পরিবর্তে এসেছে গুরুত্ববহ

> বহু কাহিনী ও ঘটনা-তাড়িত চরিত্রের ভিড়। সব কিছুর সাক্ষী আবার উপন্যাসের উত্তম পুরুষ নায়ক সুদীপ্ত শাহিন। সুদীপ্ত শাহিনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে শিল্পী রচনা করেছেন পাকিস্তানের দুই যুগের বাঙালির জীবনভাষ্য। (সুধাময় ২০১৫: ৩১৯)

আনোয়ার পাশা 'মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রহরে যুদ্ধের যে উত্তাপ ও উৎপীড়ন প্রত্যক্ষ করেছেন তাকেই তিনি এ উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন' (আব্দুর ২০০৮: ৯৪)। উপন্যাসের প্রারম্ভিক বয়ান 'বাংলাদেশে নামল ভোর' (আনোয়ার ২০১৯: ১)—এই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি যেমন লেখকের নিজস্বতার স্বাক্ষর বহন করে; তেমনি এর সমাপ্তিসূচক কথনে প্রতিফলিত হয় তাঁর শুভ ও কল্যাণবোধের ভাবনাটিও। 'নতুন মানুষ, নতুন পরিচয় এবং নতুন একটি প্রভাত' (আনোয়ার ২০১৯: ১৮০) দেখার প্রত্যয় যে কথাশিল্পী ব্যক্ত করেন, তার ভেতরেই প্রোথিত থাকে বাঙালির সমস্ত অর্জনের গৌরবগাথা। বলা যায় 'একটি নতুন দেশ এবং নতুন জাতির উদ্‌গমের ইশারা এক তীব্র রাজনৈতিক চেতনার সুফল' (ফরিদা ১৯৯৯: ১৬৯)। আনোয়ার পাশা রাজনীতিতে উৎসাহী ছিলেন না, প্রগতিশীল হলেও বামপন্থী আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর তেমন কোনো উৎসাহ ছিল না। ভাবের দিক থেকে ধর্মনিরপেক্ষ অথচ বাম রাজনীতিতে উৎসাহহীন; কিন্তু তাঁর মানবতাবোধ ছিল অটুট। যে কারণে আলোচ্য উপন্যাসের মুখ্য কুশীলব সুদীপ্ত কোনো রাজনৈতিক আদর্শ দ্বারা চালিত নয়। বরং এক মুক্তমনের মানুষ এবং প্রগতিশীল চেতনায় বিশ্বাসী। ঔপন্যাসিক সুদীপ্ত শাহিনকে দিয়ে সময়ের দায়কে বহন করিয়েছেন এ উপন্যাসে। যদিও স্বীয় শ্রেণির ক্ষুদ্র বলয় থেকে বেরিয়ে এসে বৃহতের সন্ধানে তাকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেননি। কারণ:

> সুদীপ্ত শাহিন এ উপন্যাসে একটি মধ্যবিত্ত চরিত্র। সত্যিকার অর্থে তা লেখকের নিজেরই আত্মপ্রকৃতি। নিজের কথনে আওড়ান তিনি তার সময়কে। মুক্তিযুদ্ধের বীভৎস কাহিনীর বর্ণনাই শুধু নয় মুক্তিযুদ্ধ কেন অনিবার্য ছিল, মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তির উন্মাদনা, বিভিন্ন দলের ভূমিকা তৎপরতা লেখক তাঁর বচনে ব্যাখ্যা করেন। আনোয়ার পাশা অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেন নি ঠিকই কিন্তু মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একটি সত্য প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। সুদীপ্ত শাহীনের জীবনের অনিকেত ভাবনা আছে, আশ্রয়ের সন্ধানে সে ঘুরে বেড়ায়। সারাক্ষণ একটা সচেতন মধ্যবিত্ত প্রবণতাই তার মধ্যে কাজ করে, সন্দেহ নেই। কিন্তু জনযুদ্ধের ময়দানে তার প্রতিক্রিয়াকে কি অস্বীকার করা যায়? মানুষ তার নিজ নিজ অবস্থানে থেকেই চেতনাকে কাজে লাগায়। আত্মজৈবনিক ভাবনায় আনোয়ার পাশার উপন্যাসে সে চেতনাই প্রাধান্য পেয়েছে। (শহীদ ২০০৩: ১৩৫)

*রাইফেল রোটি আওরাত* উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের যাপিত জীবনের প্রতিচ্ছবির প্রতিফলন অনুপস্থিত; বরং যুদ্ধ-পূর্বমুহূর্তের অবরুদ্ধ সময়ের শৈল্পিক স্বর আনোয়ার পাশার শিল্পিত বয়ানে পূর্ণ রূপ লাভ করেছে। সময়ের স্রোতধারাকে আত্মস্থ করে তিনি আখ্যানে বাঙ্ময় করেছেন নিপীড়িত জনতার হাহাকার, আর্তনাদ, রক্তাক্ত অশ্রুধারা। আনোয়ার পাশার অবলোকন-লব্ধ অভিজ্ঞতার বিন্যাসে পাকিস্তানি সেনাদের বর্বর আক্রমণের চিত্র উপন্যাসে প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে। ছোট ছোট বাক্যের ভেতর দিয়ে গতিচঞ্চল সময়ের প্রতিচ্ছবি চিত্রাত্মক পরিচর্যা রীতিতে চমৎকারভাবে প্রকাশ পেয়েছে। দৃষ্টান্ত:

> নীরবে মেয়েকে কোলে নিয়ে বাইরে গেলেন সুদীপ্ত। বারান্দা পেরিয়ে বাগানে নামলেন। কয়েকটি গোলাপ ফুটে আছে একটি গাছে। সেদিকে যেতেই মেয়ে হাত বাড়িয়ে দেখাল জবা। সারা গাছ ভ'রে আছে অজস্র জবা। যেন সদ্যরক্তস্নাত গাছটা মধ্যাহ্নকে ব্যঙ্গ করছে। সুদীপ্ত ঐ গাছের সারা সবুজ অঙ্গে রক্তের ছাপ দেখলেন। আর এগোতে পারলেন না। মেয়েকে আরো নিবিড় ক'রে জড়িয়ে ধরলেন বুকের মধ্যে। (আনোয়ার ২০১৯: ১০২)

এভাবে শব্দের পর শব্দ জুড়ে দিয়ে আনোয়ার পাশা অবরুদ্ধ ঢাকা নগরের ভীতিকর চিত্র অঙ্কন করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধ শুরুর ঠিক পূর্বমুহূর্তে বাঙালির শ্বাসরুদ্ধকর সময়ের জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে *রাইফেল রোটি আওরাত* উপন্যাসের সমগ্র স্থান জুড়ে। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাত এবং ২৬শে থেকে ২৮শে মার্চ এই সংক্ষিপ্ত সময়সীমায় ঘটে-যাওয়া বীভৎস কাহিনি উপন্যাসের বাস্তবতাকে নির্মাণ করেছে। 'কালবেলার বিশ্বস্ত চিত্র উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে লেখক চরিত্র ও ঘটনা সৃজনে ছিলেন একনিষ্ঠ' (অনিরুদ্ধ ২০০৫: ৬৪)। উপন্যাসের কিছু অংশে ক্ষীণ আলোর আভাস থাকলেও সমগ্র ঘটনা জুড়ে রয়েছে ধ্বংস ও নৈরাশ্যের চিত্র। উপন্যাসের পরতে পরতে বিভিন্ন চরিত্রের আধারে সমসময়, ইতিহাস ও রাজনীতির পুনরাবৃত্তি চলে লেখকের বয়ানে। শিল্পীর দায়বদ্ধতায় তার অঙ্গীকার ঘোষিত হয়; কখনো তীর্যক দৃষ্টিকোণে শানিত ভঙ্গিমায় উপস্থাপন করেন ঔপন্যাসিক। যে ঔপন্যাসিক নির্লিপ্ততার গুণে রচনা শিল্পোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে, এ গ্রন্থে তার পূর্ণ প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। 'উপন্যাসটি আনোয়ার পাশার আত্মজৈবনিক অভিজ্ঞতার বস্তুনিষ্ঠ শিল্পরূপ' (মনজুর ২০১৩: ৮৪)। ইতিহাসের নৃশংসতম অধ্যায়ে অবস্থান করে বাঙালির অবরুদ্ধ সময়ের স্বর সাবলীল ও বাস্তবানুগ ভাষায় তিনি তুলে এনেছেন। বলা যায়, ইতিহাসের মর্মন্তুদ স্বাক্ষর এ উপন্যাস অবরুদ্ধ সময়ের স্মারক।

## টীকা

১. ১৯২৮ সালের ১৫ই এপ্রিল (২রা বৈশাখ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ) পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর মহকুমার রাঙামাটি চাঁদপাড়া ইউনিয়নের ডাবকাই গ্রামে মুহম্মদ আনোয়ার পাশা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মকরম আলী, মা সাবেরা খাতুন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক পদের আবেদনপত্র থেকে জানা যায়, ১৯৩৯ সালে আনোয়ার পাশা ভাবতা আজিজিয়া উচ্চ মাদ্রাসায় ভর্তি হন; ১৯৪৬ সালে ওই মাদ্রাসা থেকে প্রথম বিভাগে হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে ১৯৪৮ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন দ্বিতীয় বিভাগে। দেশভাগের পর ১৯৪৮-এ রাজশাহী কলেজে বিএ ক্লাসে ভর্তি হন। এই কলেজ থেকে ১৯৫১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। পরবর্তী সময়ে ১৯৫১ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এমএ শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯৫৩ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

   আনোয়ার পাশার আঠারো বছরের কর্মজীবনের সূচনা হয় ১৯৫৩ সালের ৮ই ডিসেম্বর। ওই দিন তিনি মানিকচক হাই মাদ্রাসায় শিক্ষকতায় যোগ দেন। সোয়া তিন মাস সেখানে শিক্ষকতার পর তিনি ১৯৫৪ সালের ১৫ই মার্চ ভাবতা হাই মাদ্রাসায় যোগদান করেন। সেখানে প্রায় তিন বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা নিয়ে ১৯৫৭ সালে ১লা ফেব্রুয়ারি সাদিখান দিয়াড় বহুমুখী উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে যোগ দেন আনোয়ার পাশা। এই স্কুলে শিক্ষকতা করেন এক বছর। ১৯৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করে তিনি পাকিস্তান আসেন এবং ২রা মার্চ পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে বাংলা বিভাগে প্রভাষক পদে যোগ দেন। পরবর্তীকালে তিনি এই কলেজে বাংলা বিভাগের

অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হন। এডওয়ার্ড কলেজে অধ্যাপনাকালে তিনি ১৯৬৬ সালের ২২শে এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে প্রভাষক পদে নিয়োগের জন্য আবেদন করেন। ১লা নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগে জুনিয়র লেকচারার হিসেবে আনোয়ার পাশা যোগদান করেন। পরবর্তীসময়ে ১৯৭০ সালের ২২শে জুন তিনি সিনিয়র লেকচারার পদে উন্নীত হন।

চুয়াল্লিশ বছর বয়স হওয়ার আগেই আলবদর ঘাতকদের হাতে নির্মমভাবে শহিদ হন আনোয়ার পাশা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আবাসিক এলাকা থেকে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর সহযোগী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী ধর্মান্ধ দালাল আলবদর বাহিনী তাঁকে ধরে নিয়ে হত্যা করে ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর।

২. আনোয়ার পাশার তৃতীয় উপন্যাস *রাইফেল রোটি আওরাত* ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে রচিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানিদের বাঙালি বিদ্বেষ, বাঙালিদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের মনোভাব ও আচরণ এবং অসহায় বাঙালিদের ওপর দলখদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নির্যাতন ও গণহত্যা এই রচনার বিষয়। আনোয়ার পাশার মৃত্যুর পর ১৯৭৩ সালের মে মাসে (বৈশাখ ১৩৮০) উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে প্রকাশিত তাঁর অভিজ্ঞতার বিবরণ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের একটি ঐতিহাসিক দলিল বলা যায়। পশ্চিম পাকিস্তানিদের সম্পর্কে লেখকের মনোভাবও এই রচনায় অকপটে প্রকাশ পেয়েছে। ১৯৭৬ সালে বাংলা একাডেমি প্রকাশ করেন কবীর চৌধুরী অনূদিত এই উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ *RIFLES, BREAD AND WOMEN.*

৩. ইংরেজি 'জেনোসাইড' শব্দটি বাংলায় 'গণহত্যা' হিসেবে স্বীকৃত, যার অর্থ বিশেষ কোনো জনগোষ্ঠী বা ধর্ম, বর্ণ ও বিশ্বাসের মানুষের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত পন্থায় পরিচালিত ব্যাপক হত্যাকাণ্ড, আক্রমণ ও পীড়ন—যা সেই জনগোষ্ঠীকে আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। জাতিসংঘের ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের 'জেনোসাইড কনভেনশনে' এই সংজ্ঞা স্বীকৃত। সে কারণে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মাটিতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের স্থানীয় দোসরদের হাতে যে নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ ঘটে, তা সব অর্থেই 'গণহত্যা' বা 'জেনোসাইড।'

## সহায়কপঞ্জি


অনিরুদ্ধ কাহালি (২০০৫)। *বাংলাদেশের কথাসাহিত্য প্রসঙ্গে*। ঢাকা: টুম্পা প্রকাশনী।

আনোয়ার পাশা (২০১৯)। *রাইফেল রোটি আওরাত*। ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ।

আব্দুর রহিম (২০০৮)। *ভাষা ও সাহিত্য: কতিপয় প্রবন্ধ*। ঢাকা: গতিধারা।

আমিনুর রহমান সুলতান (২০১৮)। *বাংলাদেশের কবিতা ও উপন্যাস: মুক্তিযুদ্ধের চেতনা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

আহমেদ মাওলা (২০১৫)। *মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বাংলাদেশের সাহিত্য*। ঢাকা: মুক্তধারা।

গোলাম মুরশিদ (২০১০)। *মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

ফরিদা সুলতানা (১৯৯৯)। *বাংলাদেশের উপন্যাসে জীবন চেতনা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (১৯৯৯)। *বাংলাদেশের সাহিত্য*। ঢাকা: অবসর।

বেগম আকতার কামাল (২০১৪)। 'রাইফেল রোটি আওরাত: দিশা-বিদিশার আবর্ত', *উলুখাগড়া* অষ্টাদশ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪২০, ফেব্রুয়ারি ২০১৪। ঢাকা।

ভূঁইয়া ইকবাল (২০২১)। *শহিদ বুদ্ধিজীবী জীবনী গ্রন্থমালা: আনোয়ার পাশা*। ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মনজুর রহমান (২০১৩)। *আনোয়ার পাশার কথাসাহিত্য: জীবনোপলব্ধির রূপ-রূপান্তর*। ঢাকা: সাহিত্যকথা।

মনসুর মুসা (২০০৮)। *পূর্ব বাঙলার উপন্যাস*। ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন।

মালেকা বেগম (২০২০)। *মুক্তিযুদ্ধে নারী*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

মোহাম্মদ আনোয়ার সাঈদ (২০১৪)। *মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের উপন্যাস*। ঢাকা: জোনাকী প্রকাশনী।

শহীদ ইকবাল (২০০৩)। *রাজনৈতিক চেতনা: বাংলাদেশের উপন্যাস*। ঢাকা: সাহিত্যিকা।
শামসুল হুদা চৌধুরী (১৯৮৪)। *একাত্তরের রণাঙ্গন*। ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউজ।
সারোয়ার জাহান (১৯৯১)। *বাংলা উপন্যাস: সেকাল একাল*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।
সোহেল মাজহার (২০২৩)। *বাংলাদেশের উপন্যাস: কৃষক বিদ্রোহ থেকে মুক্তিযুদ্ধ*। ঢাকা: অবসর।
সুধাময় দাস (২০১৫)। *বাংলা উপন্যাসে জাতীয়তাবোধ*। ঢাকা: মনন প্রকাশ।